মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর বার্তা

নবপর্যায় : সপ্তম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, জুন ২০২৬

প্রয়াত বীরাঙ্গনা মুক্তিযোদ্ধা টেপরী বর্মণ স্মরণ

প্রামাণ্যচিত্র ‘জন্মসাথী’র বিশেষ প্রদর্শনী ও মুক্ত আলোচনা

সময়টা ১৯৭২ সাল, মধ্য জানুয়ারী। সদ্য স্বাধীন দেশ। শবনম ফেরদৌসির জন্ম স্বাধীন দেশের রাজধানী ঢাকার হলি ফ্যামিলি রেডক্রস হাসপাতালে। তিনি শুনেছেন, ওইদিন হলি ফ্যামিলি হাসপতালে ১৩ জন শিশুর জন্ম হয়। বড় হবার পর জেনেছেন ১৩ জন শিশুর মধ্যে ৩/৪ জন ছিলো ‘যুদ্ধশিশু’। জানার পরপরই তার মনে অন্য একটি ভাবনার উদয় হয়, তিনিও তো হতে পারতেন ঐ ৩/৪ জনের একজন! ধীরে ধীরে ভাবনাটি তাকে আকড়ে ধরে। স্বাধীনতার ৪৩ বছর পর তিনি খুঁজতে শুরু করেন নাম-পরিচয় না জানা সেই ১২ ‘জন্মসাথী’দের। তাদেরই একজন যুদ্ধশিশু সুধীর বর্মণ ও তার মা টেপরী বর্মণ।

গত ২২ মে, ২০২৬ তারিখে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের চলচ্চিত্র কেন্দ্রের উদ্যোগে প্রয়াত বীরাঙ্গনা মুক্তিযোদ্ধা টেপরী বর্মণ স্মরণে প্রামাণ্যচিত্র ‘জন্মসাথী’র বিশেষ প্রদর্শনী ও মুক্ত আলোচনার আয়োজন করা হয়। জাদুঘরের মূল মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত এই প্রদর্শনী ও মুক্ত আলোচনায় মুক্তিযোদ্ধা, গবেষক, শিক্ষক, মানবাধিকারকর্মী ও তরুণ প্রজন্মসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের উপস্থিতিতে বীরাঙ্গনা ও যুদ্ধশিশুদের ইতিহাস, স্মৃতি এবং রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতির প্রশ্ন নতুন করে আলোচনায় উঠে আসে। অনুষ্ঠানের শুরুতে উপস্থিত সবাই দাঁড়িয়ে প্রয়াত বীরাঙ্গনা মুক্তিযোদ্ধা টেপরী বর্মণের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। প্রদর্শনীর আগে নির্মাতা প্রামাণ্যচিত্রটি নির্মাণের অভিজ্ঞতা দর্শকদের সাথে শেয়ার করেন। প্রদর্শনী শেষে নির্মাতা ৭-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

গবেষণার জন্য ‘মীর আশরাফুল হক রিসার্চ ফান্ড’ হস্তান্তর

বাংলাদেশে একাত্তরে সংঘটিত গণহত্যা বা জেনোসাইড, তার নিষ্ঠুরতার স্বরূপ ও কার্যকারণ, গণহত্যাকারীদের লক্ষ-উদ্দেশ্য ও মানসিকতা বিশ্লেষণ, ন্যায়বিচার ও সত্য-প্রতিষ্ঠা, সংঘাত হানাহানি ও ঘৃণার বিপরীতে সহনশীলতা ও সম্প্রীতি জোরদার এবং শান্তির শিক্ষা প্রচারে গবেষণা ও গবেষণা-লব্ধ জ্ঞান প্রসারের লক্ষে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরকে এককালীন ১ কোটি টাকা এনডাউমেন্ট ফাণ্ড বা স্থায়ী তহবিল হিসেবে সংরক্ষণের জন্য প্রদান করেছেন ড. মবিনুল হক। গত ১৮ মে এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তিনি মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি ডা. সারওয়ার আলীর হাতে এই চেক প্রদান করেন তিনি। এসময়ে সিএসজিজের একঝাঁক তরুণ গবেষক মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন। ডা. মবিনুল হক বলেন, তার পিতা মীর আশরাফুল হক পুলিশ বিভাগের সদস্য হিসেবে সবসময় ন্যায় প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট ছিলেন। তিনি এই তরুণদের নিয়ে খুবই আশাবাদী বলে উল্লেখ করেন, তার প্রত্যাশা নবীন গবেষকরা ইতিহাসের সত্যকে ৫-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

সাংবাদিকতায় বজলুর রহমান স্মৃতিপদক ২০২৫

সনদ ও পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠান : ১৮ মে ২০২৬

‘মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি কখনোই মুছে ফেলা সম্ভব হবে না, আমরা আমাদের জায়গা থেকে দায়িত্ব পালন করে যাব’, ইলেকট্রনিক বিভাগে রজলুর রহমান স্মৃতি পদকে সেরা প্রতিবেদক যমুনা টেলিভিশনের জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক আহমেদ রেজা তার অভিব্যক্তি প্রকাশে একথা বলেন। তিনি উপস্থিত অগ্রজদের একথার মধ্য দিয়ে আশ্বস্ত করার সাথে সাথে তরুণ সাংবাদিকের পাশে থাকারও অনুরোধ জানান। দ্যা ডেইলি স্টার পত্রিকার প্রতিবেদক আহমাদ ইশতিয়াক প্রিন্ট ও অনলাইন বিভাগে ‘বজলুর রহমান স্মৃতি পদক ২০২৫’ গ্রহণ করে বলেন, ‘মুক্তিযুদ্ধের প্রতি দায়বোধ থেকে, বলা যায় জন্ম ইতিহাসের ঋণ শোধের তাগিদ থেকে প্রতিবেদন করি।’ ‘বজলুর রহমান স্মৃতিপদক’ বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনাভিত্তিক সাংবাদিকতায় কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের জন্য প্রদান করা একটি সম্মানজনক পুরস্কার। দায়িত্বশীল সাংবাদিকতার প্রতীক এবং দৈনিক সংবাদের প্রয়াত ৪-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

আলী যাকের মুক্তিযুদ্ধের গ্রন্থপাঠ উদ্যোগ

সনদ ও পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠান : ১৫ মে ২০২৬

অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে উৎসবের আবহ নিয়ে আয়োজিত অনুষ্ঠানের মধ্যে 'সুলতানার স্বপ্ন' সৃজনশীল গ্রন্থপাঠ এবং 'আলী যাকের মুক্তিযুদ্ধের গ্রন্থপাঠ উদ্যোগ' অন্যতম। গত ১৫ মে ২০২৬ চতুর্থ পর্বের আয়োজন হলো 'আলী যাকের মুক্তিযুদ্ধের গ্রন্থপাঠ উদ্যোগ'-এর অনুষ্ঠান। দেশজুড়ে ৪৭টি বেসরকারি পাঠাগারের অংশীদারিত্বে ও অংশগ্রহণে দিনব্যাপী এই আয়োজন মুখর ছিল পাঠাগার সদস্য, পাঠ-প্রতিক্রিয়ালেখা শিক্ষার্থীর ভিড়ে। অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি ছিলেন নাট্যজন মামুনুর রশীদ। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের প্রতিষ্ঠাতা ট্রাস্টি আলী যাকের স্মরণে আয়োজিত উৎসবানুষ্ঠানে পাঠ-প্রতিক্রিয়ার ভিত্তিতে স্কুল এবং কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের ১০ জন করে সেরা ২০ শিক্ষার্থীকে পুরস্কৃত করা হয়। স্কুলপর্যায়ে নির্বাচিত হুমায়ূন আহমেদের 'অনিল বাগচীর একদিন' এবং কলেজ পর্যায়ে মাহমুদুল হকের 'খেলাঘর' উপন্যাসের উপর ভিত্তি করে ৪৪০টি পাঠ-প্রতিক্রিয়া জমা পড়েছিল। এই উদ্যোগে সম্পৃক্ত থাকার জন্য ২০টি বেসরকারি পাঠাগারকেও ১০ হাজার টাকার বই কেনার গিফটকার্ড সম্মাননা দেওয়া হয়েছে।

দিনের শুরুতে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে উপস্থিত হয় সেরা ২০ শিক্ষার্থী। তারা প্রথমে মুক্তিযুদ্ধের প্রামাণ্যচিত্র এবং জাদুঘরের গ্যালারি ঘুরে দেখে। এসব অভিজ্ঞতার আলোকে তারা নিজের আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটায় কাগজে-কলমে। পরে স্কুল এবং কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে তাদের সঙ্গে আলাদাভাবে অন্তরঙ্গ মত বিনিময় করেন যথাক্রমে হেনা সুলতানা এবং চিত্রপরিচালক শামীম আখতার। জাদুঘর দেখার প্রতিক্রিয়ায় ১০ম শ্রেণির ছাত্রী, খুলনার অবকাশ গ্রন্থাগারের সদস্য তানজীম কবীর তুবা লিখেছে, এই ভ্রমণ একটি অসাধারণ নৈতিক কম্পাস তৈরি করে। ভবিষ্যৎ জীবনে আমি যা-ই করি না কেন, তা যেন মুক্তিযোদ্ধাদের ত্যাগের প্রতি সম্মান জানিয়ে দেশের প্রতি ভালোবাসা ও নিষ্ঠার সাথে হয়। এই ভ্রমণ আমাকে এটাও শিখিয়েছে, অন্যায়ের সামনে চুপ থাকলে একদিন নিজেকেই ক্ষতিগ্রস্ত হতে হয়। সিরাজগঞ্জের বীর মুক্তিযোদ্ধা আ ফ ম মাহবুবুল হক পাঠাগারের সদস্য মো. মুশফিক মোজাহিদ আকিব লিখেছে, মুক্তিযুদ্ধে শরণার্থীদের জীবনচিত্র ছিল খুবই শোচনীয় এবং বর্ণনাতীত। মুক্তিযুদ্ধে মহিলাদের অবদান দেখে আমি হতবাক হয়েছি। এত অবদান রাখার পরও ইতিহাসে তাঁদের ঠাঁই হয়নি। সবচেয়ে জঘন্য চরিত্র ছিল আলবদর, আলশামস, রাজাকারদের।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব মামুনুর রশীদ বলেন, আলী যাকের প্রমাণ করেছেন নাটক মুক্তিযুদ্ধের ফসল। তাঁর মঞ্চে কখনো মুক্তিযুদ্ধবিরোধী কোনো শব্দ উচ্চারিত হয়নি। প্রসঙ্গত শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে তিনি বলেন, আমাদের বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় কোনো আনন্দ নেই। শিক্ষার্থীরা শুধু পাঠ্যবই পড়তে বাধ্য হয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'অপাঠ্য বই'য়ের মধ্যে যে আনন্দ ও শিক্ষা আছে, তা থেকে তারা বঞ্চিত হচ্ছে। কেবল নম্বরের প্রতিযোগিতা দিয়ে শিক্ষিত ও মানবিক সমাজ গড়া সম্ভব নয়। এই ক্ষতিকর প্রতিযোগিতা থেকে আমাদের বেরিয়ে আসতে হবে। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি ও নাট্যজন সারা যাকের বলেন, বর্তমানে সোশ্যাল মিডিয়ার প্রাদুর্ভাবে তরুণ সমাজ অধৈর্য হয়ে উঠছে। এই সময়ে তরুণদের বই পড়া খুবই জরুরি। আমরা চাই নতুন প্রজন্ম ডিজিটাল পর্দার প্রভাব থেকে দূরে সরে বইমুখী হোক। অনুষ্ঠানটি আয়োজন করতে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে সহযোগিতা করে 'মঙ্গল দীপ ফাউন্ডেশন'।

অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য দেন বাংলাদেশ বেসরকারি গ্রন্থাগার সংহতির আহ্বায়ক শাহনেওয়াজ এবং জুরিবোর্ডের সদস্য হেনা সুলতানা। সমাপনী বক্তব্যে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি ও সদস্যসচিব মফিদুল হক বিজয়ীদের অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, লাইব্রেরি আলোর মশাল জ্বালিয়ে রেখেছে। নতুন প্রজন্মকে এ মশাল-মিছিলে শরিক করতে হবে। বই পড়ার উৎসব থাকবে চলমান এবং ভবিষ্যতে ৫০টির বেশি লাইব্রেরিকে এর সঙ্গে সংযুক্ত করা হবে।

– সত্যজিৎ রায় মজুমদার
মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর

গণহত্যার শিক্ষা থেকে শান্তির অঙ্গীকার

১১তম রেসিডেন্সিয়াল স্কুলের সমাপ্তি

গণহত্যা শুধু ইতিহাসের একটি অধ্যায় নয় এটি মানবতার বিরুদ্ধে সংঘটিত এমন এক অপরাধ যার স্মৃতি ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সচেতন, মানবিক ও দায়িত্বশীল করে তুলতে পারে। সেই লক্ষকে সামনে রেখে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সেন্টার ফর দ্য স্টাডি অব জেনোসাইড অ্যান্ড জাস্টিস আয়োজিত "Learning from Genocide towards Peace and Justice" শীর্ষক ১১তম বার্ষিক রেসিডেন্সিয়াল স্কুলের সমাপ্তি ঘটে ৩০ এপ্রিল ২০২৬ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে আয়োজিত সমাপনী অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে।

অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করে সিএসজিজের ভলান্টিয়ার এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক শিক্ষার্থী নূসরাত তাবাসসুম। সাতদিনের একসঙ্গে শেখা, আলোচনা, দলীয় কাজ এবং বন্ধুত্বের স্মৃতিগুলো শেষ দিনের পরিবেশকে অর্থবহ করে তোলে। সমাপনী অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ ছিলো "Awareness and Action: Social Campaign Competition"-এর চূড়ান্ত পর্ব। অংশগ্রহণকারীরা বিভিন্ন সামাজিক ও মানবিক ইস্যুকে কেন্দ্র করে তাদের তৈরি অডিও-ভিজ্যুয়াল ক্যাম্পেইন উপস্থাপনা করেন। এবারের প্রতিযোগিতায় সম্মতি, ধর্মীয় সম্প্রীতি, মব ভায়োলেন্স, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সহিংসতার উসকানি এবং নেতৃত্বে নারীর অংশগ্রহণের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উঠে আসে। বিচারকদের মূল্যায়নে নারীর ক্ষমতায়ন ও নেতৃত্ব বিষয়ক ভিডিওটি সেরা নির্বাচিত হয়। তরুণদের গবেষণাভিত্তিক চিন্তা, সৃজনশীল উপস্থাপনা এবং সামাজিক পরিবর্তনের প্রত্যয় উপস্থিত সবাইকে মুগ্ধ করে। এরপর অংশগ্রহণকারীদের পক্ষ থেকে উপস্থাপন করা হয় "Declaration of Intent"। এই ঘোষণাপত্রে তারা মানবতা, ন্যায়বিচার, সহনশীলতা এবং শান্তির পক্ষে কাজ করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। তারা বলেন, শুধু অতীতের গণহত্যা স্মরণ করাই যথেষ্ট নয় বরং সমাজে ঘৃণা, বিভাজন ও সহিংসতার বিরুদ্ধে সচেতন অবস্থান নেওয়াও জরুরি। তরুণ প্রজন্মের এই প্রতিশ্রুতি অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিদের মধ্যেও আশাবাদ তৈরি করে। অনুষ্ঠানে অভিজ্ঞতা বিনিময় করেন দুইজন অংশগ্রহণকারী। আন্তর্জাতিক অংশগ্রহণকারী আদার্শ মেহরা তার বক্তব্যে বলেন, দক্ষিণ এশিয়ায় গণহত্যা, স্মৃতি ও ন্যায়বিচারের প্রশ্নকে নতুনভাবে উপলব্ধি করার সুযোগ তৈরি করেছে এই রেসিডেন্সিয়াল স্কুল। বিভিন্ন দেশের অংশগ্রহণকারীদের সঙ্গে মতবিনিময় তাকে মানবাধিকার ও শান্তি প্রতিষ্ঠার বিষয়ে আরও সচেতন করেছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন। অন্যদিকে বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস-এর

৫-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

১১তম বার্ষিক রেসিডেনশিয়াল স্কুল

গণহত্যার শিক্ষা থেকে শান্তি ও ন্যায়বিচারের পথে এক অনন্য অভিজ্ঞতা

সেন্টার ফর দ্য স্টাডি অব জেনোসাইড অ্যান্ড জাস্টিস আয়োজিত "Learning from Genocide towards Peace and Justice" শীর্ষক ১১তম বার্ষিক রেসিডেনশিয়াল স্কুল অনুষ্ঠিত হয় ২৪ থেকে ৩০ এপ্রিল ২০২৬ পর্যন্ত। টাঙ্গাইলের মির্জাপুরে অবস্থিত ঐতিহাসিক কুমুদিনী কমপেক্স ছিল এবারের আবাসিক স্কুলের ভেন্যু। সাতদিনব্যাপী আবাসিক স্কুলে বাংলাদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ও অংশগ্রহণকারীরা গণহত্যা, স্মৃতি, ন্যায়বিচার, ট্রানজিশনাল জাস্টিস, শান্তিশিক্ষা, সামাজিক সম্প্রীতি এবং নাগরিক দায়িত্ব গভীরভাবে শেখার সুযোগ পান।

এই আবাসিক স্কুলের বিশেষত্ব হলো, এটি কেবল শ্রেণিকক্ষের পাঠদানে সীমাবদ্ধ থাকে না বরং মাঠ পর্যায়ের বাস্তব অভিজ্ঞতা, দলীয় অনুশীলন, সাংস্কৃতিক পরিবেশনা, সামাজিক ক্যাম্পেইন প্রতিযোগিতার মাধ্যমে একটি পূর্ণাঙ্গ শিক্ষার পরিবেশ তৈরি করে।

২৫ এপ্রিল সকালে ভারতেশ্বরী হোমসের সাবেক শিক্ষক হেনা সুলতানা অংশগ্রহণকারীদের কুমুদিনী কমপেক্স ঘুরিয়ে দেখান এবং কমপেক্সের ইতিহাস, সমাজসেবামূলক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে ধারণা দেন। এই দিনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সেশন ছিল "Genocide Defined : Reflections on 77 Years of the Genocide Convention", ইউনিভার্সিটি অব ম্যানিটোবার সহযোগী অধ্যাপক ড. শেল অ্যান্ডারসন সেশনটি পরিচালনা করেন। তিনি ১৯৪৮ সালের গণহত্যা সনদের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট, আন্তর্জাতিক আইনে গণহত্যার সংজ্ঞা এবং রাষ্ট্রীয় দায়বদ্ধতা নিয়ে আলোচনা করেন। পরবর্তী সেশন "The 1971 Genocide: Why Memory Matters"- এ মানবাধিকার কর্মী ও শহীদ বুদ্ধিজীবী মুনীর চৌধুরীর পুত্র আসিফ মুনীর ১৯৭১ সালের গণহত্যার স্মৃতি সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা, ইতিহাস বিকৃতির বিপদ এবং তরুণ প্রজন্মের দায়িত্ব নিয়ে আলোচনা করেন। এরপর অনুষ্ঠিত হয় "State Responsibility for Genocide: The Case of Palestine" শীর্ষক সেশন, যেখানে বক্তা ছিলেন নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও ডিন, ড. মো. রিজওয়ানুল ইসলাম। তিনি ফিলিস্তিন প্রসঙ্গে রাষ্ট্রীয় সহিংসতা, আন্তর্জাতিক আইন এবং মানবাধিকার কাঠামোর সীমাবদ্ধতা নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করেন। এরপর ড. লিন্ডসি হর্নার, শিক্ষক, ইউনিভার্সিটি অব এডিনবরো, "Peace as Utopia and Peace as Event" বিষয়ে আলোচনা করেন। শান্তিকে শুধুই আদর্শিক ধারণা হিসেবে নয়, বরং একটি সামাজিক-রাজনৈতিক প্রক্রিয়া ও ঘটমান বাস্তবতা হিসেবে বোঝার দৃষ্টিভঙ্গি অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে নতুন চিন্তার পথ তৈরি করে। "R P Shaha : His Martyrdom and Legacy" শীর্ষক দিনের শেষ সেশনে বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজীব প্রসাদ সাহা, চেয়ারম্যান ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর, কুমুদিনী ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট অব বেঙ্গল। তিনি রণদা প্রসাদ সাহার আত্মত্যাগ, সমাজসেবার দর্শন এবং শিক্ষা ও মানবকল্যাণে কুমুদিনী ট্রাস্টের অবদান নিয়ে আলোচনা করেন।

তৃতীয় দিন ২৬ এপ্রিল শুরু হয় ট্রানজিশনাল জাস্টিস বিষয়ক ড. শেল অ্যান্ডারসন পরিচালিত "Transitional Justice in Post-Conflict Societies and the Fight Against Impunity for Genocide" সেশনে যুদ্ধপরবর্তী সমাজে বিচার, পুনর্মিলন এবং দায়মুক্তির সংস্কৃতির বিরুদ্ধে লড়াই নিয়ে আলোচনার মধ্য দিয়ে। এদিন একটি ব্যতিক্রমী সেশন ছিল "Teaching Sultanas Dream in the Classroom" যেখানে বক্তা ছিলেন ফাহমিদা রহমান, সিনিয়র লেকচারার ও প্রোগ্রাম ডিরেক্টর, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়। তিনি রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের সুলতানার স্বপ্ন পাঠের মাধ্যমে কীভাবে শিক্ষার্থীদের মধ্যে সমতা, মানবিকতা এবং শান্তির ধারণা তৈরি করা যায় তা ব্যাখ্যা করেন। ডিজিটাল যুগে ভুল তথ্য ও ঘৃণাবাচনের বিরুদ্ধে সচেতনতা তৈরি করতে ডিজিটাল রাইটস-এর ডেপুটি ডিরেক্টর মো: আশরাফুল হক পরিচালনা করেন "Digital Literacy Against Misinformation and Hate Speech" শীর্ষক সেশন। এদিন শান্তিশিক্ষা ও ইউনেস্কোর ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করেন ড. সুজান ভাইজ, ইউনেস্কোর বাংলাদেশ প্রতিনিধি। তাঁর সেশন "Peace Education and UNESCO" অংশগ্রহণকারীদের আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে শান্তিশিক্ষার বাস্তব প্রয়োগ সম্পর্কে ধারণা দেয়। প্যানেল আলোচনায় যোগ দেন ড. শেল অ্যান্ডারসন, ড. লিন্ডসি হর্নার ও মফিদুল হক। কীভাবে সংঘাত পরবর্তী সমাজে শান্তিশিক্ষা কার্যকরী ভূমিকা রাখতে পারে সে বিষয়ে তারা বিশদভাবে আলোকপাত করেন। এরপর মফিদুল হক পরিচালনা করেন "UNESCOs Recognition of Sultanas Dream as Memory of the World: Its Significance" সেশন, যেখানে সুলতানার স্বপ্ন কীভাবে বিশ্বস্মৃতির অংশ হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে তা ব্যাখ্যা করা হয় এবং সাহিত্য, ইতিহাস ও স্মৃতির সংযোগ তুলে ধরা হয়।

একঘেয়েমি কাটাতে ভারত থেকে আগত খ্যাতিমান শিল্পী ও গবেষক মৌসুমী ভৌমিক পরিচালনা করেন Music, Peace, and Social Cohesion in Bengal- শীর্ষক সেশন। যেখানে সঙ্গীত কীভাবে মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে এবং সামাজিক সম্প্রীতি গড়ে তুলতে সহায়তা করে সেই আলোচনা অংশগ্রহণকারীদের এক নতুন সাংস্কৃতিক উপলব্ধির দিকে নিয়ে যায়। দিনের সর্বশেষ এবং অন্যতম আকর্ষণীয় সেশন ছিল "Sultanas Dream Unbound: Womens Struggle to Break the Glass Ceiling"। এই সেশনে অংশগ্রহণ করেন বাংলাদেশের প্রথম নারী এভারেস্টজয়ী নিশাত মজুমদারসহ একদল সাহসী নারী অভিযাত্রী। তাঁদের অভিজ্ঞতা তরুণ অংশগ্রহণকারীদের কাছে নারীর সক্ষমতা, নেতৃত্ব এবং প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের অনুপ্রেরণামূলক উদাহরণ হয়ে ওঠে।

২৭ এপ্রিল, চতুর্থ দিন আরম্ভ হয় "From Mass Graves to Courtrooms: Forensic Evidence and Lessons from Guatemala" শীর্ষক সেশনের মাধ্যমে যার বক্তা ছিলেন ফ্রেডি পেচেরেলি, পরিচালক, এফএএফজি, গুয়াতেমালা। গণকবর থেকে ফরেনসিক প্রমাণ সংগ্রহ এবং বিচারপ্রক্রিয়ায় প্রমাণের ভূমিকা নিয়ে তাঁর আলোচনা অংশগ্রহণকারীদের কাছে বাস্তব ও আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতার একটি শক্তিশালী উদাহরণ তৈরি করে। এরপর ড. মো. ইমরান জাহান, অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান, ইতিহাস বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা করেন "Conflict and Harmony in Bengali Society: A Historical Perspective" শীর্ষক সেশন। তিনি বাংলার সামাজিক ইতিহাসে সংঘাত ও সম্প্রীতির ধারাবাহিকতা তুলে ধরেন এবং বর্তমান সমাজের সঙ্গে তার সংযোগ ব্যাখ্যা করেন।

২৮ এপ্রিল ছিল ফিল্ড ট্রিপ। অংশগ্রহণকারীরা টাঙ্গাইলের তাঁতপল্লী, আতিয়া জামে মসজিদ এবং ঐতিহাসিক ১৯৫৭ সালের কাগমারী সাংস্কৃতিক সম্মেলন স্থল পরিদর্শন করেন।

২৯ এপ্রিল অনুষ্ঠিত হয় লিখিত পরীক্ষা, দলীয় অনুশীলন এবং "Declaration of Intent" তৈরির কার্যক্রম। অংশগ্রহণকারীরা দলগতভাবে নিজেদের শেখা বিষয়গুলোকে ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনায় রূপ দিতে চেষ্টা করেন। পাশাপাশি আয়োজন করা হয় Awareness and Action: Social Campaign Competition, যেখানে পাঁচটি গ্রুপ সম্মতি, ধর্মীয় সম্প্রীতি, মব ভায়োলেন্স, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সহিংসতার উসকানি এবং নেতৃস্থানে নারীর পদচারণা বিষয়ে তাদের তৈরি ৫ মিনিটের অডিও-ভিজ্যুয়াল উপস্থাপন করে। এর মাধ্যমে কুমুদিনী কমপ্লেক্সে আনুষ্ঠানিক কার্যক্রমের সমাপ্তি ঘটে এবং সন্ধ্যায় শুরু হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। প্রথমে পরিবেশিত হয় কুমুদিনী নার্সিং কলেজের শিক্ষার্থীদের মনোমুগ্ধকর গান, দলগত নাচ এবং আবৃত্তি। একে একে রেসিডেনশিয়াল স্কুলের অংশগ্রহণকারীরাও কবিতা আবৃত্তি, গান এবং কৌতুক পরিবেশনার মাধ্যমে আনন্দঘন পরিবেশ সৃষ্টি করে।

সাতদিনব্যাপী এ আবাসিক স্কুলের মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীরা গণহত্যা অধ্যয়ন, স্মৃতি সংরক্ষণ, শান্তি শিক্ষা, ন্যায়বিচার এবং দায়িত্বশীল নাগরিকত্ব সম্পর্কে নতুন অভিজ্ঞতা ও গভীরতর দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করেন। তরুণ প্রজন্মের মধ্যে ইতিহাস সচেতনতা, মানবিক মূল্যবোধ এবং সামাজিক দায়বদ্ধতা গড়ে তুলতে এই উদ্যোগ একটি গুরুত্বপূর্ণ ও ধারাবাহিক প্ল্যাটফর্ম হিসেবে নিজেদের ভূমিকা বজায় রেখেছে।

নূসরাত তাবাসসুম
স্বেচ্ছাসেবক, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর

তরুণ বই পাঠকদের সাথে একদিন

শ্রদ্ধেয় নাট্যজন, মুক্তিযোদ্ধা, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সম্মানিত ট্রাস্টি আলী যাকের-এর স্মৃতি ধরে রাখতে এক অসাধারণ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর। উদ্যোগটি হচ্ছে তরুণদের ভেতরে বই পড়ার অভ্যাস গড়ে তোলার চেষ্টা। এই আয়োজনে বই পাঠ ও পাঠ-প্রতিক্রিয়ার ভিত্তিতে স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে সেরা ২০ শিক্ষার্থীকে পুরস্কার দেওয়া হয়। আয়োজনটির সাথে গোড়া থেকে আমার যুক্ত থাকার সৌভাগ্য হয়েছে। এ উপলক্ষে একটি জুরি বোর্ড আছে, আমিসহ প্রথম বাংলাদেশী নারী এভারেস্ট জয়ী নিশাত মজুমদার, কবি মিনার মনসুর, নাট্যজন ত্রপা মজুমদার, অধ্যাপক সৌরভ সিকদার ও অধ্যাপক সায়েম রানা যার সদস্য।

১৫ মে শুক্রবার মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর মিলনায়তনে সনদ ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানটি ছিল জাঁকজমকপূর্ণ, উৎসব মুখর। সারাদিনের এই চমৎকার আয়োজনে শিক্ষার্থীদের সাথে থেকে আমার এতটুকু ক্লান্তি লাগেনি। বরং তাদের সাথে নানা আলোচনায় আনন্দ পেয়েছি। তারাও তাদের কথা জানিয়েছে প্রাণ খুলে। মোবাইল ফোন, টিভি, ট্যাব, কম্পিউটার পর্দায় চোখ রেখে রেখে ওরা কী ক্লান্ত? সে ওদের চোখের দিকে তাকালেই বোঝা যায়। ওদের ক্লান্ত চোখের দিকে তাকাল মায়া হয়। এই সমস্যা ঘরে ঘরে। চরম ক্ষতি হচ্ছে অনিয়ন্ত্রিত এই অভ্যাসে সে ওরাও বুঝতে পারছে। তাই বই ও পত্রিকা পড়ায় মনোযোগ আনতে চায় তারা। নানা ধরণের বই নিয়ে আলোচনা শুনতে চায় যা বইটির প্রতি ওদের আগ্রহ তৈরি করবে। গান-বাজনা, খেলাধুলা করতে চায় কিন্তু আফসোস পরিবেশ পায় না। মনে পড়ে বিশেষ করে করোনাকালে অনলাইন ক্লাস করার সময় থেকে এই প্রবণতার সূচনা। বাবা-মায়ের সঙ্গ চায় কিন্তু তাঁরা চাকরি করেন বলে সেখানেও ঘাটতি থেকে যায়। যুগের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে হলে কিছু ছাড় দিতে হবে এ বিষয়ে তারা একমত। একমত হয়েছে বই পড়ে আনন্দ পাওয়ার ক্ষেত্রেও। এরকম আয়োজন তারা আরও চায়। আরেক বিষয়ে শিক্ষার্থীরা সহমত হয়েছে- স্কুল-কলেজের পরিবেশ তাদের কাছে মোটেই আনন্দদায়ক নয়। ওদের সাথে কথা বলতে বলতে মাথায় ভর করে ছিলেন সেই মজার মানুষটি যিনি বলেছিলেন 'বই কিনে কেউ কোনদিন দেউলিয়া হয় না'। একথায় আস্থা রেখেই সৈয়দ মুজতবা আলী বইকে আত্মীয় মেনে কাছে টেনে ছিলেন। যার সাথে ঝগড়া হয় না এবং বই জ্ঞানর্জনে ও মনের চোখ খোলার সেরা মাধ্যম।

শিক্ষার্থীদের সাথে সেই গল্পটি করেছিলাম- এক রাজা তাঁর হেকিমের একটা বই কিছুতেই বাগাতে না পেরে তাকে খুন করেন। বই হস্তগত হলো। রাজা বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে বইখানা পড়ছেন কিন্তু পাতায় পাতায় এমন জুড়ে গিয়েছে যে, রাজা বার-বার আঙুল দিয়ে মুখ থেকে থুতু নিয়ে জোড়া ছাড়িয়ে পাতা উল্টাচ্ছেন। এদিকে হেকিম আপন মৃত্যুর জন্য তৈরি ছিলেন বলে প্রতিশোধের ব্যবস্থাও করে গিয়েছিলেন। তিনি পাতায় পাতায় বইয়ের কোনের দিকে মাখিয়ে রেখেছিলেন মারাত্মক বিষ। রাজার আঙুল সেই বিষ মেখে নিয়ে যাচ্ছে মুখে।

রাজাকে এই প্রতিহিংসার খবরটিও হেকিম রেখে গিয়েছিল বইটির শেষ পাতায়। সেই বার্তা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে রাজা বিষবানের ঘায়ে ঢলে পড়লেন।

বাঙালির বই কেনা ও পড়ার প্রতি বৈরাগ্য দেখে মনে হয় সে যেন গল্পটা জানে। আর মরার ভয়ে বই কেনা, বই পড়ার ধারেকাছেও যায় না। আজকের যুগে বইপাঠের বিষয়ে এতো যে প্রতিবন্ধকতা তাতেও দমে যাননি মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি মফিদুল হক। নানাভাবে চেষ্টা করে যাচ্ছেন। ঘরে ঘরে বই পৌঁছে দিয়েই ক্ষান্ত হচ্ছেন না, বই পড়লে পুরস্কার হাতে তুলে দিচ্ছেন।

এ ক্ষেত্রেও তিনি একরকম মুক্তিযোদ্ধার ভূমিকায় নেমেছেন। আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। বিন্দু বিন্দু করে হলেও এই সংগ্রাম সফল হোক এই শুভকামনা জানাই।

প্রাক্তন শিক্ষক
ভারতেশ্বরী হোমস্, মির্জাপুর, টাঙ্গাইল

সাংবাদিকতায় বজলুর রহমান স্মৃতিপদক ২০২৫

প্রথম পৃষ্ঠার পর

সম্পাদক বজলুর রহমানের স্মৃতিকে স্মরণীয় করে রাখতে তাঁর পরিবারের সহায়তায় মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর এই পদকের প্রবর্তন করে। ২০০৮ সাল থেকে নিয়মিতভাবে প্রদান করা হচ্ছে 'বজলুর রহমান স্মৃতি পদক।' গত ১৮ মে ২০২৬ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের মিলনায়তনে প্রদান করা হল 'বজলুর রহমান স্মৃতি পদক ২০২৫।' ইলেকট্রনিক বিভাগে যুগ্মভাবে বিজয়ী হয়েছেন একাত্তর টেলিভিশনের বিশেষ প্রতিনিধি পার্থ সঞ্জয়। তিনি দেশের বাইরে থাকায় উপস্থিত হতে পারেন নি।

পদক প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি বরেণ্য চিত্রশিল্পী রফিকুন নবী (রনবী) বলেন, দেশের বিভিন্ন স্থানে ভাস্কর্য ও মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিবিজড়িত স্থাপনায় ভাঙচুরের ঘটনা ঘটেছে। এগুলো হয়েছে ইতিহাস ভুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা থেকে। এ ধরনের ঘটনাকে উদ্বেগজনক বলে উল্লেখ করে তিনি বলেন, মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি কখনো মুছে ফেলা সম্ভব নয়। নতুন প্রজন্ম এখনো এসব বিষয়ে সচেতন রয়েছে। আমরা একাত্তরের স্মৃতি নিয়ে বেঁচে আছি। আমাদের পরিবর্তন করানো সম্ভব নয়। খুব ভালো লাগছে যে দেশের তরুণরা এখনও একাত্তর নিয়ে সোচ্চার আছে এবং মনে করি থাকবে।

অনুষ্ঠানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের সাবেক সভাপতি অধ্যাপক গোলাম রহমান বলেন, নতুন প্রজন্মের কাছে মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস তুলে ধরা এসময়ের বড় দায়িত্ব। এটাতে দ্বিধার সুযোগ-নেই। যারা একাত্তরের স্মৃতি টিকেয়ে রাখছেন তাদের ধন্যবাদ। একাত্তরের সাথে কোনো কিছু তুলনীয় নয়। দুঃখজনক যে, অনেকে ৫২, ৬৯, ৭১ এবং ২৪-কে গুলিয়ে ফেলে।

স্বাগত ভাষণে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি সারওয়ার আলী বলেন, পাকিস্তান আমলে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক যে বৈষম্য ছিল, তার বিরুদ্ধে যে গণতান্ত্রিক, জাতীয়তাবাদী আন্দোলন হয়েছে, সেটা সাহসিকতার সাথে জনসম্মুখে তুলে ধরেছেন সাংবাদিকেরা। এক্ষেত্রে তিনি স্মরণ করেন ইত্তেফাক সম্পাদক তোফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া, সংবাদ সম্পাদক জহুর হোসেন চৌধুরী এবং অবজারভার সম্পাদক আব্দুস সালামকে। তিনি বলেন মুক্তিযুদ্ধের পরেও জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলনে বজলুর রহমান উত্তরসূরিদের পথে হেঁটেছেন। তিনি মনে করেন মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস নতুন প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দিতে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার গুরুত্ব রয়েছে। যখন মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে সংবাদ প্রকাশে স্থবিরতা চলছিল তখন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর সব গুরুত্বপূর্ণ স্মারক, দলিল এবং তথ্যাদি সাংবাদিকদের কাছে উন্মুক্ত করেছে। এতে তারা গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ প্রকাশের সুযোগ লাভ করেছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

সমাপনী বক্তব্যে জাদুঘরের ট্রাস্টি ও সদস্যসচিব মফিদুল হক বলেন, বাংলাদেশের ইতিহাসের সাথে সাংবাদিকের সম্পৃক্তি আর দশটা দেশের চাইতে আরো গভীর, আরো ব্যপক। ৫০ ও ৬০-এর দশকে সাংবাদিকরা যে ভূমিকা পালন করেছেন তা বর্তমানের তরুণ সাংবাদিকদের জন্য শিক্ষণীয় বিষয় এবং অনুপ্রেরণার জায়গা। একাত্তরে সাংবাদিকদের ভূমিকা ছিল অসাধারণ। এখন যারা কাজ করছেন তাদের জন্ম একাত্তরের অনেক পরে, কিন্তু তারা কাজের মধ্য দিয়ে মুক্তিযুদ্ধের প্রতি তাদের অঙ্গীকার প্রকাশ করছেন, তার সঙ্গে একধরনের সংবেদনশীলতা, মমত্ববোধও তারা দেখাচ্ছেন। আমরা এখনও তাদের নিয়ে দারুণ আশাবাদী।

আলী যাকের মুক্তিযুদ্ধের গ্রন্থপাঠ উদ্যোগের আলোকে পাঠাভ্যাস গঠনে গ্রন্থাগারের করণীয় বিষয়ে মতবিনিময় সভা

উত্তরের জেলা লালমনিরহাট থেকে দক্ষিনের খুলনা, বরিশাল হয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম, সর্বত্রই ব্যক্তিপ্রচেষ্টায় গড়ে ওঠা বেসরকারি পাঠাগারগুলো সচেষ্ট রয়েছে পাঠক সৃষ্টিতে। এসব বেসরকারি পাঠাগারের সমন্বয়ে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর বিগত ৪ বছর ধরে পরিচালনা করছে 'আলী যাকের মুক্তিযুদ্ধের গ্রন্থপাঠ উদ্যোগ'। ১৫ মে ২০২৬ এই পাঠ উদ্যোগের সনদ ও পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠনে সম্মিলিত হয়েছিলেন বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্তের পাঠাগারসমূহ। তাদের নিয়ে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর আয়োজন করে আলী যাকের মুক্তিযুদ্ধের গ্রন্থপাঠ উদ্যোগের অভিজ্ঞতার আলোকে নতুন প্রজন্মের পাঠাভ্যাস গঠনে গ্রন্থাগারের করণীয় শিরোনামে এক বিশেষ মতবিনিময় সভা। শুরুতে গ্রন্থপাঠের বিচারকাজের সাথে সংশ্লিষ্ট যাচাই-বাছাই কমিটির সদস্য গরবষক ও সাংবাদিক সিরাজুল ইসলাম আবেদ তার অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে পাঠ-প্রতিক্রিয়া লেখার ক্ষেত্রে তারা যে সমস্যগুলো চিহ্নিত করেন তার একটি বর্ণনা দেন। তিনি বলেন এআই জেনারেটেড লেখা পাওয়া যাচ্ছে, গুগল থেকে অন্য কারো লেখা কপি করে তারপর জমা দেওয়া হচ্ছে, অনেক শিক্ষার্থী বই না পড়ে অবান্তর লেখা লিখছে বা রিভিউ লিখছে। তিনি মনে করেন, পাঠ্য বইয়ের বাইরে অন্য বই পড়তে উৎসাহ দিতে অভিভাবকদের সহযোগিতা প্রয়োজন।

রংপুরের পায়রাবন্দের নূরুলদীন স্মৃতি পাঠাগারের পক্ষ থেকে শংকা প্রকাশ করে বলা হয়, মুক্তিযুদ্ধ বিরোধীদের অপতৎপরতা শিশুদের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে এ ব্যাপারে পদক্ষেপ নিতে হবে পাশাপাশি বিশেষ দিবস কেন্দ্র করে প্রতিযোগিতার আয়োজন করতে হবে।

উত্তরা পাবলিক লাইব্রেরির পরিচালনা পর্ষদের সদস্য শ্রাবণী তূর্ণা কয়েকবছর আগে ছিলেন পাঠ উদ্যোগের প্রতিযোগী। তার দৃষ্টিতে, পাঠ্যবইয়ের বাইরে আউট বই পড়ার ব্যাপারে অভিভাবকদের অসহযোগিতা পাঠাভ্যাস গঠনে একটি বড়ো বাধা, কাজেই অভিভাবকদের সচেতন করতে হবে। সৃজনশীল বইয়ের পাঠাভ্যাস বাড়ানোর লক্ষ্যে সেমিনার আয়োজন করতে হবে। রাঙামাটির চেলাছড়া পাঠাগার প্রতিনিধি মনে করেন গ্রন্থাগারে প্রকৃত পাঠক সৃষ্টি করতে হবে। মুকুল ফৌজ পাঠাগারের পক্ষ থেকেও মনে করা হয় নবীনদের পাঠাভ্যাস গঠনে অভিভাবকদের আগ্রহ বাড়াতে হবে, তাদের পাঠাগার মায়েদের জন্য গ্রন্থপাঠ প্রতিযোগিতা আয়োজন করে বলে উল্লেখ করা হয়। কামাল স্মৃতি পাঠাগারের অভিজ্ঞতা থেকে জানা যায় তারা নির্বাচিত বই প্রথমে নিজেরা পড়েন। বই পড়ার পর মুক্ত আলোচনার আয়োজন করেন। তাদের মতে মুক্তিযুদ্ধের বই নিয়ে অভিভাবকদের মধ্যে বিভক্তি আছে এটা দূর করতে হবে। বরিশালের নীলু মনি স্মৃতি পাঠাগার দিবসভিত্তিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকে। চট্টগ্রাম, রাউজানের শিলানন্দ পাঠাগার এলাকাভিত্তিক ক্যাম্পেইন করে বই বিতরণ করে ও এক মাস পরে পুরনো বই নিয়ে এসে নতুন বই প্রদান করে। প্রতিবার বই দেওয়ার সময় শর্ত থাকে 'আপনি বইটি ফেরত দেওয়ার সময় একটি মূল্যায়ন/পাঠ প্রতিক্রিয়া লিখবেন।' প্রতি দুই বছর অন্তর তারা ম্যাগাজিন প্রকাশ করে এবং পাঠকদের কাছ থেকে লেখা আহবান করে। এর পাশপাশি বিভিন্ন কবি-সাহিত্যিকদের নিয়ে পাঠচক্রের আয়োজন করে। বাংলাদেশ বেসরকারি গ্রন্থাগার সংহতির সদস্য সচিব মোহাম্মদ জহিরউদ্দিন বলেন, আলী যাকের গ্রন্থপাঠ উদ্যোগ চালু রাখা উচিত তবে স্কুল-কলেজের সূচি দেখে কর্মসূচি প্রণয় করতে হবে যাতে পরীক্ষার সাথে সাংঘর্ষিক না হয়। নির্বাচিত বই নিয়ে পাঠাগারে সাহিত্য সভা আয়োজন করার পরামর্শ তিনি প্রদান করেন যাতে পাঠক সৃষ্টি হয়। আলোচনার পরিসমাপ্তিতে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি ও সদস্য সচিব মফিদুল হক বলেন, এই উদ্যোগটি নির্দিষ্ট সময়কেন্দ্রিক না হয়ে বছরব্যাপী করার কথা ভাবতে হবে। তিনি মনে করেন যদি এখনই বই নির্বাচন করা যায় তবে সাহিত্যসভাসহ নানা আয়োজন করতে সুবিধা হবে। সারা বছর পারস্পারিক সম্মিলন ও সংযোগ রক্ষা করে সকলে মিলে এগিয়ে যাবার কথা বলেন তিনি। যারা পুরস্কৃত হয়েছে তাঁদের প্রতি পাঠাগারগুলোকে যত্নবান হবার পরামর্শ প্রদান করেন। তিনি পাঠাগারকে আনন্দময় জায়গা হিসেবে গড়ে তোলার পরামর্শ দেন। তিনি মনে করেন এই সম্মিলনটার মধ্য দিয়ে পরস্পরের জানা বোঝা চেনা হয়েছে আরো নিবিড়ভাবে।

১১তম রেসিডেন্সিয়াল স্কুলের সমাপ্তি

২-এর পৃষ্ঠার পর

সহকারী অধ্যাপক সুমায়তা মারজান বলেন, এই আয়োজন শুধু একটি একাডেমিক কার্যক্রম নয় বরং এটি মানবিকতা ও সামাজিক দায়িত্ববোধ শেখার বাস্তব অভিজ্ঞতা। মুক্তিযুদ্ধ, গণহত্যা এবং শান্তিশিক্ষা নিয়ে অনুষ্ঠিত সেশনগুলো তার চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গিতে ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে বলেও তিনি জানান। অন্যদিকে ভলান্টিয়ারদের মধ্য থেকে অভিজ্ঞতা শেয়ার করেন মোস্তাক বারী ফাহিম ও ইসরাত জাহান গোধূলি, বিভিন্ন কার্যক্রম সমন্বয়ের অভিজ্ঞতা তাদের ব্যক্তিগত ও পেশাগত জীবনেও গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলবে বলে তারা মত প্রকাশ করেন। এছাড়া রেসিডেন্ট মেন্টর AJAR-এর বাংলাদেশ কার্যক্রম প্রধান নাসরিন আক্তার ও বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস এর আইন বিভাগের সহকারী অধ্যাপক আমেনা জাহান উর্মী অংশগ্রহণকারীদের প্রশংসা করে বলেন, তরুণদের মধ্যে ইতিহাস, মানবাধিকার ও শান্তিশিক্ষা নিয়ে এমন আগ্রহ ভবিষ্যতের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। তাদের মতে ইতিহাস শুধু অতীত জানার বিষয় নয় বরং একটি মানবিক ও ন্যায়ভিত্তিক সমাজ গঠনের শক্তিশালী ভিত্তি। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি ত্রপা মজুমদার। তিনি অংশগ্রহণকারী, ভলান্টিয়ার ও আয়োজকদের ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, এ ধরনের আয়োজন তরুণদের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, মানবিক মূল্যবোধ ও সামাজিক দায়বদ্ধতা ছড়িয়ে দিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। এরপর সিএসজিজের রিসার্চ অ্যাসোসিয়েট মেহজাবিন নাজরানা অংশগ্রহণকারীদের ফলাফল ঘোষণা করেন। এ সময় সেরা পারফর্মার হিসেবে নির্বাচিত হন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুষদের শিক্ষার্থী যারীন তাসনিম রিমি। সমাপনী বক্তব্য দেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ট্রাস্টি ও সদস্যসচিব এবং সিএসজিজের পরিচালক মফিদুল হক। তিনি বলেন, গণহত্যা ও মানবতাবিরোধী অপরাধের ইতিহাস স্মরণ করা শুধু অতীতের প্রতি দায়বদ্ধতা নয় বরং ভবিষ্যৎকে আরও মানবিক করারও একটি প্রয়াস। তরুণদের সক্রিয় অংশগ্রহণই ভবিষ্যতে শান্তি, ন্যায়বিচার ও মানবাধিকারের পক্ষে শক্তিশালী ভূমিকা রাখতে পারে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

– আরাফাত রহমান, ভলান্টিয়ার, সিএসজিজে

মীর আশরাফুল হক রিসার্চ ফান্ড

২-এর প্রথম পৃষ্ঠার পর

প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে। এই অর্থ থেকে অর্জিত আয় সংশ্লিষ্ট বিষয়ে গবেষণার জন্য ব্যয়িত হবে। এর পরিচালনার দায়িত্ব পালন করবে সেন্টার ফর দা স্টাডি অব জেনোসাইড অ্যাণ্ড জাস্টিস।মীর আশরাফুল হকের জন্ম ১৯১৬ সালে। পিতা মীর মোফাজ্জল হোসেন ছিলেন অবসরপ্রাপ্ত সাব রেজিস্ট্রার। মায়ের নাম ফয়জুন্নেসা খাতুন। পৈতৃক ঠিকানা : মীর মঞ্জিল, সিপাই পাড়া, মুন্সিগঞ্জ সদর। মীর আশরাফুল হক মুন্সিগঞ্জ থেকে স্কুলশিক্ষা সমাপন করে ঢাকা কলেজ থেকে ইন্টারমিডিয়েট পাশ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাস বিভাগে পড়াকালে পুলিশ বিভাগে চাকরিতে যোগ দেন। ১৯৪৬ সালের শেষে নোয়াখালী সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসেবে মহাত্মা গান্ধীর দাঙ্গা-পীড়িত নোয়াখালীর গ্রাম পরিক্রমণের সূচনাকালে তিনি বিশেষ দায়িত্ব পালন করেন। শ্রীরামপুর গ্রামে তিন সপ্তাহ গান্ধীর অবস্থানকালে তিনি দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসেবে তাঁর পরিচিতি পেয়েছিলেন। বই পড়া ও ছবি তোলায় তাঁর ছিল আগ্রহ। এক অর্থে তিনি ছিলেন স্ব-শিক্ষিত ও স্ব-নির্মিত ব্যক্তিত্ব। উচ্চপদে চাকরি না করলেও শিল্প-সংস্কৃতি ও ক্রীড়া ক্ষেত্রে বিচরণ তাঁকে বিশেষ সম্মানিত আসন দিয়েছিল। তিনি মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের পরিচালনা পরিষদের সদস্য ছিলেন। ১৯৫৫-৫৬ সালে তিনি ইস্ট পাকিস্তান স্পোর্টস ফেডারেশনের মহাসচিবের দায়িত্ব পালন করেন। এই সময়ে ঢাকায় নতুন স্টেডিয়াম নির্মাণে তাঁর ছিল বিশেষ ভূমিকা। তিনি ঢাকার নাট্যজগতের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন এবং পুলিশ ক্লাবের নাটকসহ বিভিন্ন নাটক মঞ্চায়ণে সংগঠকের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের সময় এস. এম. হলে পুলিশী অভিযানকালে তিনি মাহবুব-উল আলম চৌধুরীর "কাঁদতে আসিনি, ফাঁসির দাবি নিয়ে এসেছি" কবিতার মুদ্রিত কতক কপি উদ্ধার করেন এবং এর একটি বাড়িতে এনে স্ত্রী ও বোনের হাতে তুলে দেন গোপনে সংরক্ষণের জন্য। একুশে ফেব্রুয়ারিতে আই.বি কর্মকর্তা হিসেবে তিনি ঘটনাস্থল থেকে কিছুটা দূরে কর্মরত ছিলেন এবং গুলির শব্দ শুনেছিলেন। পরে বিচারপতি এলিস কমিশনে সাক্ষ্যদানকালে তিনি স্পষ্টভাবে গুলিবর্ষণের সত্যতা মেলে ধরেছিলেন। ১৯৬৪ সালের ৩০ জুন ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে মাত্র ৪৮ বছর বয়সে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তখন তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র মবিনুল হকের বয়স ছিল দশ। তাঁদের মা জোবেদা খাতুন পিতার আদর্শ পাঁচ পুত্র ও এক কন্যাকে লালন করেছেন।

মবিনুল হকের জন্ম ১৯৫৪ সালে ঢাকায়। গভর্নমেন্ট ল্যাবরেটরি স্কুল ও ঢাকা কলেজের প্রাক্তন এই ছাত্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগ থেকে প্রথম শ্রেণিতে স্নাতোকত্তোর পাশ করে খাদ্য ও পুষ্টিবিজ্ঞান বিভাগে লেকচারার হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন । পরবর্তীতে কানাডাস্থ ওয়েস্টার্ন ইউনিভার্সিটি থেকে অর্থনীতিতে এমএ এবং পিএইচডি করেন এবং ১৯৮৪ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত কানাডার ইউনিভার্সিটি অব সাসক্যঅুয়ানে অধ্যাপনা করেন। ১৯৬৯ সালে দশম শ্রেণির ছাত্র থাকা-কালীন গণঅভূত্থানে যুক্ত হন।

শেকড়ের সন্ধানে টাঙ্গাইল: ঐতিহাসিক কাগমারী সম্মেলন, তাঁতী পল্লী ও আতিয়া মসজিদ দর্শন

ইতিহাস, ঐতিহ্য এবং বাংলার শেকড়ের সন্ধানে গত ২৮ এপ্রিল ২০২৬, মঙ্গলবার, সেন্টার ফর স্টাডি অফ জেনোসাইড এন্ড জাস্টিস আয়োজিত ১১তম রেসিডেন্সিয়াল স্কুলের সকল অংশগ্রহণকারীদের নিয়ে একটি বিশেষ শিক্ষাসফর অনুষ্ঠিত হয়। এই সফরের মূল গন্তব্য ছিল টাঙ্গাইল জেলা, যেখানে ছড়িয়ে আছে বাংলার সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসের অমূল্য উপাদান।

প্রাক-সফর প্রস্তুতি : মূল সফরে যাওয়ার পূর্বে অংশগ্রহণকারীদের জন্য একটি বিশেষ সেশনের আয়োজন করা হয়। ২৭ এপ্রিল ২০২৬ রাত ৮:৩০ থেকে ৯:৩০ পর্যন্ত চলা এই সেশনের মূল বিষয় ছিল ১৯৫৭ সালের ঐতিহাসিক কাগমারী সাংস্কৃতিক সম্মেলন প্রাঙ্গণ এবং তাঁতি পল্লি পরিদর্শনের প্রস্তুতি। এই অধিবেশনে ফ্যাসিলিটেটর হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রখ্যাত অভিনেতা, নির্দেশক ও নাট্যকার মামুনুর রশীদ এবং রবীন্দ্র সৃজনকলা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ।

অধ্যাপক শাহেদের আলোচনার সূত্র ধরে আমরা টাঙ্গাইলের সন্তোষের ইতিহাস সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য লাভ করি। আমরা জানতে পারি যে, সন্তোষে ১৮৭০ সালে একটি প্রাচীন স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এখানকার খোশনবপুর এলাকাটি হযরত শাহজামানের স্মৃতিবিজড়িত এবং এই অঞ্চলে জমিদারী প্রথা ১৯৫১ সাল পর্যন্ত প্রবলভাবে বিদ্যমান ছিল। এছাড়াও অধ্যাপক শাহেদ ও মামুনুর রশীদ মওলানা ভাসানীর রাজনৈতিক দর্শন, আতিয়া জামে মসজিদ এবং টাঙ্গাইলের তাঁতশিল্পের গুরুত্ব সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেন, যা আমাদের সফরের জন্য একটি চমৎকার রূপরেখা তৈরি করে দেয়।

টাঙ্গাইলের পথে যাত্রা :২৮ এপ্রিল (রেসিডেন্সিয়াল স্কুলের ৫ম দিন) মঙ্গলবার ভোর ৭:৩০টায় নাস্তার পালা সমাপ্ত করে রেসিডেন্ট মেন্টরদের সার্বিক তত্ত্বাবধানে সকাল ৮:৩০ মিনিটে আমরা সকল ভলান্টিয়ার ও অংশগ্রহণকারী টাঙ্গাইলের উদ্দেশে যাত্রা শুরু করি। সকাল ৯:৩০ মিনিটে আমরা আমাদের নির্ধারিত গন্তব্যে পৌঁছাই এবং শুরু হয় আমাদের দিনব্যাপী ঐতিহাসিক স্থানগুলো পরিদর্শন।

তাঁতি পল্লি ও ঐতিহ্যবাহী আতিয়া জামে মসজিদ: সফরের শুরুতেই আমরা পরিদর্শনে যাই টাঙ্গাইলের ঐতিহ্যবাহী তাঁতি পল্লিতে। বাংলার বয়নশিল্পের এক জীবন্ত জাদুঘর এই তাঁতি পল্লি। তাঁত শ্রমিকদের কর্মচাঞ্চল্য এবং সুতোর বুননে ফুটে ওঠা নিপুণ শিল্পকর্ম আমাদের মুগ্ধ করে। গানের তালে তালে তাঁতিদের কাজ করা এবং সুন্দরভাবে বিভিন্ন নকশা ফুটিয়ে তোলা সবাইকে বিস্মিত করে। এরপর আমরা পরিদর্শন করি প্রাচীন স্থাপত্যের অপূর্ব নিদর্শন 'আতিয়া জামে মসজিদ', যা

বাংলার সমৃদ্ধ ইসলামিক স্থাপত্যরীতির এক অনন্য প্রতীক।

শতাব্দীর আলো ঐতিহাসিক কাগমারী সম্মেলন (১৯৫৭) এর স্থান পরিদর্শন : আমাদের সফরের সবচেয়ে আকর্ষণীয় অংশ ছিল ১৯৫৭ সালের ঐতিহাসিক কাগমারী সাংস্কৃতিক সম্মেলনের স্থান পরিদর্শন। মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে কাগমারী সম্মেলনের স্মারকস্তম্ভ রয়েছে। আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে প্রথমেই মাওলানা ভাসানীর সমাধিস্থল পরিদর্শন করি, যেখানে তার সাথে তার স্ত্রীর কবর এবং তার থাকার কুঁড়েঘরটি দেখার সৌভাগ্য হয়। এরপর মাওলানা ভাসানীর নাতি আজাদ খান ভাসানী আমাদেরকে মাওলানা ভাসানী জাদুঘর, রিসার্চ সেন্টার, সাবান কারখানাসহ মাওলানা ভাসানীর তৈরি প্রতিষ্ঠান ঘুরে দেখান এবং এই সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য অবহিত করান। আমরা ঐতিহাসিক দরবার হল পরিদর্শন করি যেখানে মাওলানা ভাসানী বিভিন্ন সভা, সমাবেশ করতেন। কাগমারী সম্মেলনের একটি অংশ এখানে অনুষ্ঠিত হয়। এরপর আমরা ঐতিহাসিক কাগমারী সম্মেলনের স্মারকস্তম্ভ পরিদর্শন করি।

দুপুর ৩:৩০ মিনিটে আমরা ঐতিহাসিক স্মৃতি আর বুকভরা অভিজ্ঞতা নিয়ে ফিরতি যাত্রা শুরু করি। এই শিক্ষাসফর আমাদের কেবল বইয়ের পাতার ইতিহাসের সাথেই পরিচয় করায়নি, বরং বাংলার রাজনৈতিক পালাবদল এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের জীবন্ত দলিলগুলোর সামনে দাঁড় করিয়েছে।

-মোস্তাক বারী ফাহিম, ভলান্টিয়ার, সিএসজিজে

আন্তর্জাতিক জাদুঘর দিবস: বিভক্ত বিশ্বের মেলবন্ধনে জাদুঘর

২২ মে ২০২৬

সারা বিশ্বের জাদুঘরের উন্নয়ন ও সমসাময়িক সমস্যা নিয়ে ১৯৭৮ সাল থেকে প্রতিবছর ১৮ মে আন্তর্জাতিক জাদুঘর দিবস পালন করে আন্তর্জাতিক জাদুঘর পরিষদ (আইকম)। ১৯৯২ সাল থেকে একটি প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করে দিবসটি পালন করা হয়। ২০২৬ সালের প্রতিপাদ্যে বলা হয়েছে, "Museums uniting a divided world" আইকম বাংলাদেশ যার বাংলা করেছে "বিভক্ত বিশ্বে মেলবন্ধনে জাদুঘর"। এরই ধারাবাহিকতায় ২২ মে ২০২৬ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর সেমিনার হলে পালিত হলো আন্তর্জাতিক জাদুঘর দিবস। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর ও আন্তর্জাতিক জাদুঘর পরিষদ (আইকম) যৌথভাবে ÒEchoes of Tomorrow: Museum f) or UnityÓ শীর্ষক বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান আয়োজন করেছে। আয়োজনে সকলকে স্বাগত জানিয়ে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি ও সদস্য সচিব মফিদুল হক বলেন, জাদুঘর ইতিহাস ঐতিহ্য ধারণের পাশাপাশি মানুষে মানুষে সম্পর্ক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। অশান্ত পৃথিবীর যুদ্ধ বন্ধেও জাদুঘর ভূমিকা রাখতে পারে। লিঙ্গ বৈষম্য দূরীকরণে সমাজিক দায়বদ্ধতা রয়েছে জাদুঘরের।

অনুষ্ঠানে "আগামীর প্রতিধ্বনি: সম্প্রীতির জাদুঘর" শীর্ষক বিশেষ মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন কেবিনেট ডিভিশনের তোষাখানা মিউজিয়াম কিউরেটর রাশেদুল আলম প্রদীপ। তিনি বলেন, বিশ্বে বিভক্তির কারণ হিসেবে দেখা যায়, পারিবারিক-সামাজিক-প্রাতিষ্ঠানিক বৈষম্য, একতা ও অংশীজনদের অনুপস্থিতি, মানবিক মূল্যবোধের অভাব, একে অপরের প্রতি নিঃস্বার্থ ভালোবাসা ও সহযোগিতার অভাব প্রভৃতি। সমাজব্যবস্থায় প্রায়ই মানুষের মধ্যে হিংসা, লোভ, অস্থিরতা বিরাজ করছে। ফলে শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটছে বিশেষ করে। এক্ষেত্রে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যচর্চার মাধ্যমে দর্শকদের গ্যালারি পরিদর্শন, বিনোদনসহ অতীত ঐতিহ্য সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনে সহায়তা করে থাকে জাদুঘর। যা শিক্ষা ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখার পাশাপাশি শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা, সামাজিক মূল্যবোধ তৈরিতে অসামান্য অবদান রেখে চলেছে। বর্তমান প্রজন্মকে শিক্ষানুরাগী ও বই পড়ার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টির লক্ষ্যে জাদুঘর শিশুদের জন্য শিশু লাইব্রেরি করতে পারে, যা শিশুদের ডিজিটাল আসক্তি

৭-এর পাতায় দেখুন

‘সুলতানার স্বপ্ন’ সমতা, শান্তি ও মানবিকতার স্বপ্ন দেখায়

অধ্যাপক ড. লিন্ডসে কে. হর্নার

ঢাকা এবং জেলা পর্যায়ের নির্বাচিত কলেজের ইংরেজি শিক্ষকদের অংশগ্রহণে ‘শ্রেণিকক্ষে সুলতানার স্বপ্ন সৃজনশীল পাঠ-কর্মসূচি প্রণয়ন’ বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হলো মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সেমিনার হলে। যুক্তরাজ্যের এডিনবরা ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক ড. লিন্ডসে কে. হর্নার পরিচালিত কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয় ২৯ এপ্রিল ২০২৬ সকাল ১০টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত। এতে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের ১৮ জন ইংরেজি শিক্ষক, কয়েকজন শিক্ষাবিদ এবং পাঠাগার প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। ‘শিক্ষাবিদদের জন্য সুলতানার স্বপ্ন : ইউটোপিয়ার উদ্ভাসন’ আনুষ্ঠানিক উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা উদ্যোগ ম্যানুয়াল উন্নয়নের জন্য কর্মশালায় পাঁচ জন শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে তাদের লেসন প্লান উপস্থাপন করেন পাওয়ার পয়েন্টে।

স্বাগত বক্তব্যে জাদুঘরের ট্রাস্টি ও সদস্যসচিব মফিদুল হক বলেন, উদ্যোগটি শুধু একটি সাহিত্যচর্চা নয়; এটি একটি বৃহত্তর সামাজিক ও শিক্ষামূলক প্রকল্প। তিনি দুটি মূল বিষয় উল্লেখ করেন– ১. কমিউনিটি লাইব্রেরিভিত্তিক কার্যক্রম ও ২. শ্রেণিকক্ষে পাঠ কার্যক্রম। তিনি বলেন, এই উদ্যোগ ভবিষ্যতে বাংলাদেশের আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক শিক্ষায় ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। তিনি আরও জানান যে, University of Cambridge, University of Edinburgh Ges BRAC University এই উদ্যোগে সহযোগিতা করছে।

অধ্যাপক ড. লিন্ডসে কে. হর্নার বলেন, সুলতানার স্বপ্ন শুধু একটি সাহিত্যকর্ম নয়; এটি কল্পনা, হাস্যরস ও উচ্চাকাঙ্ক্ষার মাধ্যমে সমতা, শান্তি ও মানবিকতার স্বপ্ন দেখায়। তিনি শিক্ষকদের পেশাগত বিচক্ষণতার প্রশংসা করে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত থেকে কাজ চালিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান। তিনি আরও বলেন, শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক পদ্ধতি শিক্ষাকে আরও প্রাণবন্ত করে তোলে। কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তুলে ধরে তিনি জানান, পরীক্ষাভিত্তিক শিক্ষার বাইরে গিয়ে ‘পাঠের আনন্দ’কে গুরুত্ব দিতে হবে। পাঠদানে সহমর্মিতা, কল্পনা ও অনুপ্রেরণার মতো বিষয় যুক্ত করা প্রয়োজন। শুধু প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে বোঝাপড়া যাচাই যথেষ্ট নয়; শিক্ষার্থীরা বাস্তব জীবনে ধারণা প্রয়োগ করতে পারছে কি না, তা দেখা দরকার।

কর্মশালায় আলোচনার সার-সংক্ষেপ ও প্রস্তাবিত সুপারিশমালা ছিল নিম্নরূপ :

উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে সুলতানা’জ ড্রিম ইংরেজি পাঠ্যবইয়ে অন্তর্ভুক্ত আছে ‘আনন্দপাঠ’ হিসেবে এবং পরীক্ষায় অন্তর্ভুক্ত নেই। ফলে শিক্ষার্থী ও শিক্ষক উভয়ের কাছে এর গুরুত্ব কম। সুলতানা’জ ড্রিম-এর গুরুত্ব তুলে ধরতে কলেজের অভ্যন্তরীণ মূল্যায়ন এবং শ্রেণি পরীক্ষায় এটা অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।

ছাত্র-অভিভাবক-শিক্ষকের কাছে গুরুত্ব কম হওয়ায় কলেজ প্রশাসন ছাত্র-অভিভাবকদেও জন্য পাঠ-উদ্যোগের মাধ্যমে সুলতানা’জ ড্রিমের গুরুত্ব সম্পর্কে অবহিত করাতে ব্যবস্থা নিতে পারে।

বর্তমানে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো নিজস্ব উদ্যোগে পাঠ-পরিকল্পনা তৈরি করে পাঠদান করছে। সাধারণত ৪০ মিনিট করে তিনটি ক্লাসে পাঠদান শেষ হয়। এতে রিডিং, বাড়ির কাজ এবং শ্রেণিভিত্তিক কাজের মাধ্যমে পাঠদান হয়ে থাকে। সেই সাথে সৃজনশীলভাবে বিতর্ক, পোস্টার তৈরি, দলগত আলোচনা, নাটকের মতো শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক সৃজনশীল কার্যক্রমগুলোকে শিখণ পদ্ধতি হিসেবে ব্যবহার করলে সুলতানা’জ ড্রিম পাঠের উদ্দেশ্য পূরণ হতে পারে। উদ্ভাবনী শিখণ পদ্ধতির জন্য সৃজনশীল শিক্ষকদের প্রণোদনা ও আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতির ব্যবস্থাও করা যায়।

সুলতানা’জ ড্রিম-এ উপস্থাপিত লিঙ্গসমতা, নারীবাদ, পরিবেশ, বিজ্ঞান ও শান্তি বিষয়ে আলোচনা সহজতর করতে প্রয়োজনীয় তাত্ত্বিক জ্ঞানে শিক্ষকদের সমৃদ্ধ হওয়া জরুরি। শ্রেণিতে পরিষ্কারভাবে সুলতানা’জ ড্রিম-এর বার্তাগুলো তুলে ধরা প্রয়োজন। এর জন্য কর্তৃপক্ষ প্রশিক্ষণ, কর্মশালা ইত্যাদির ব্যবস্থা করতে পারে।

সুলতানা’জ ড্রিম-এর বক্তব্য শিক্ষার্থীদের কাছে যথার্থভাবে পৌঁছানো দরকার। বার্ষিক সাংস্কৃতিক সপ্তাহ, বিজ্ঞান মেলা, আন্তর্জাতিক নারী দিবস এবং রোকেয়া দিবস পালনের মাধ্যমে এটা করা যেতে পারে। আগামী ডিসেম্বর ২০২৬ রোকেয়া দিবস পালনের প্রস্তুতি ও পরিকল্পনা দরকার।

উদ্যোগী কলেজ ও গ্রন্থাগারগুলোতে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সংশ্লিষ্ট উপকরণ– সুলভ সংস্করণ ‘সুলতানার স্বপ্ন’, এর পিডিএফ লিংক, অডিও বুক-এর লিংক ইত্যাদি সম্ভাব্য ক্ষেত্রে সরবরাহ করা যেতে পারে।

আন্তর্জাতিক জাদুঘর দিবস: বিভক্ত বিশ্বের

৬-এর পৃষ্ঠার পর

থেকে ফিরিয়ে আনতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে বলে তিনি মনে করেন। মানসিক স্বাস্থ্য বিকাশে এবং সামাজিক বিচ্ছিন্নতা দূরীকরণে সব শ্রেণির দর্শকদের জাদুঘর পরিদর্শনে আসার আহ্বান জানানো, ঐতিহ্য সংরক্ষণে সচেতনতা সৃষ্টি করা, সেমিনার-সিম্পোজিয়াম করে পূর্বপুরুষদের সমৃদ্ধ সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়াসহ জ্ঞান আদান-প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে বলে তিনি মনে করেন। বাংলাদেশে ২০২৪ সালের গণ-অভ্যুত্থান ও ৫ আগস্টের সরকার পতনের পর বিভিন্ন প্রত্নতাত্ত্বিক, ঐতিহাসিক নিদর্শন, ভাস্কর্য, বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘর, গণভবন ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে, যা নিয়ে আইকম বাংলাদেশ উদ্বেগ প্রকাশ করেছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। তিনি বলেন আমাদের আত্মপরিচয়ের অন্যতম প্রতিষ্ঠান জাদুঘর। সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণে সবাই ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করি, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য সুন্দর, মানবিক বোধসম্পন্ন পরিবার, সমাজ, দেশ, রাষ্ট্র তথা বিশ্ব গড়ে তুলি। আইকম বাংলাদেশের সদস্য এবং হেরিটেজ ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক জাহাঙ্গীর হোসেন এবার বিশ্বে মোট ১৫৮টি দেশে আন্তর্জাতিক জাদুঘর দিবস পালিত হয়েছে উল্লেখ কওে বলেন, বিভক্ত বিশ্বে জাদুঘর আশার আলো। জাদুঘর নিছক কোনো প্রদর্শনী নয় ;এটা মানুষে মানুষে অতীতের সাথে বর্তমানের মেল বন্ধন।

সভাপতির বক্তব্যে অধ্যাপক ড. সুফি মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, বর্তমান বিশ্বে শান্তি আনয়নে জাদুঘর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। বিভক্ত বিশ্বের মেলবন্ধন হলো জাদুঘর। যুদ্ধকবলিত বর্তমান বিশ্বের যুদ্ধ বন্ধে জাদুঘর ভূমিকা রাখতে পারে।

তবে সমন্বয়ের অভাবে জাদুঘর যথাযথ ভূমিকা রাখতে পারছেনা। এজন্য প্রয়োজন যোগ্য লোকের যোগ্য পদে পদায়ন। এটা সময়েরও দাবী। এ বিষয়ে যথাযথ দায়িত্ব পালনের জন্য তিনি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

প্রামাণ্যচিত্র ‘জন্মসাথী’র বিশেষ প্রদর্শনী

প্রথম পৃষ্ঠার পর

শবনম ফেরদৌসি, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি ও সদস্য-সচিব মফিদুল হক এবং প্রমাণ্যচিত্রটি নির্মাণে নির্মাতার সহযোগী ও বন্ধু শাহিনা হাফিজ ডেইজি দর্শকদের সাথে মুক্ত আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর পর্বে অংশ নেন।

আলোচনা পর্বে বক্তারা প্রয়াত বীরাঙ্গনা মুক্তিযোদ্ধা টেপরী বর্মণের সংগ্রামী জীবন, সাহস, আত্মত্যাগ এবং মাতৃত্বের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানান। তাঁরা বলেন, মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস কেবল যুদ্ধক্ষেত্রের বীরত্বগাথায় সীমাবদ্ধ নয়; এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে অসংখ্য বীরাঙ্গনা ও যুদ্ধশিশুর না বলা মানবিক গল্প, যেগুলো দীর্ঘদিন ধরে আড়ালে রয়ে গেছে। বক্তারা আরও উল্লেখ করেন, যুদ্ধশিশু ও বীরাঙ্গনাদের জীবনসংগ্রাম নিয়ে এখনও পর্যাপ্ত আলোচনা ও গবেষণা হয়নি। এ ধরনের আয়োজন নতুন প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের মানবিক ইতিহাস সম্পর্কে জানাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে তারা আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

টেপরী বর্মণের জন্ম ঠাকুরগাঁয়ের রানীশংকৈল উপজেলায়। ১৯৭১ সালে স্থানীয় রাজাকার তাঁকে পাকিস্তানি আর্মির হাতে তুলে দেয়। ৭ মাস তিনি ক্যাম্পে ধর্ষণের শিকার হন। এরপর স্বাধীন দেশে জন্ম দেন যুদ্ধশিশু সুধীরের। শত্রু সন্তান জন্ম দেয়ার অপরাধে গ্রামসমাজ তাঁদের একঘরে করে ফেলে। “জন্মসাথী” প্রামাণ্যচিত্রে তুলে ধরা হয় তাঁর ও সুধীরের জীবন সংগ্রামের কাহিনি। এরপর ২০১৭ সালে তিনি বীরাঙ্গনা মুক্তিযোদ্ধার সম্মাননা পান। গত ১২ মে, ২০২৬ তারিখ, মঙ্গলবার তিনি স্বগৃহে মৃত্যুবরণ করেন। শেষজীবনে প্রাপ্য সম্মান ও স্বীকৃতি পেয়েছিলেন তিনি। গৃহপ্রাঙ্গণে জাতীয় পতাকায় আবৃত ছিল তাঁর মরদেহ, সরকারিভাবে গান স্যালিউট দিয়ে বিউগল বাদনের মাধ্যমে তাঁর প্রতি নিবেদিত হয় জাতির শ্রদ্ধা।

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর বার্তা | প্রথম সংখ্যা, জুন ২০২৬

মুক্তিযুদ্ধে পরিবার প্রধানহারা শহীদজায়ার জীবন সংগ্রাম

প্যানেল আলোচনা: ৯ মে ২০২৬

শহিদ জায়া নন্দ রানী বণিকের (নেত্রকোনা) স্বামী দর্জির কাজ করতেন। ১৯৭১ সালে ৩ জন সন্তান ছিল। বড় মেয়ে আরতী ৭ বছর, ছেলে হরেকৃষ্ণ ৫ বছর, ছোট মেয়ে লক্ষ্মী ৯ মাস। মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী ঘোড়াইলে, স্বামীর বাড়িতে বাচ্চাদের নিয়ে ফিরে এসে সংসারের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব তিনি নিজে নেন। তার বয়স তখন কম ছিলো বিধায় জমি-জমার হিসেব বুঝতেন না। স্বামীর জমি চাষ করতো যারা, তারা কেউই জমি বুঝিয়ে দেয়নি তাকে। বাড়ির আঙ্গিনায় তিনি নিজেই চাষ করতেন। বাড়িতে নানান সবজি লাগাতেন, কচু, কচুর লতি টুকায়ে এনে রান্না করে কোনোমতে ভাতে-মাড়ে খাওয়াতেন বাচ্চাদের। তার ভাষ্যে, 'এরমধ্যে শরীর ঢেকে রেখেও জান বাঁচতো না, ক্রমাগত বিয়ের জন্য চাপ আসতো।' যারা আগে রাজাকার ছিল, তাদের নজর ছিল নন্দ রানী বণিক এবং তার বড়ো মেয়ের ওপর। সেই অত্যাচারে বাধ্য হয়ে বাচ্চাদের নিয়ে কেন্দুয়া বাজারের বাসায় চলে আসেন তারা। শহিদ পরিবার হিসেবে সরকার থেকে দুই হাজার টাকা পেয়েছিল ১৯৭২ সনে। বাবা সেই টাকার সাথে কিছু টাকা মিলিয়ে কেন্দুয়া বাজারে একটু জায়গা কিনে রেখে দেন। বড় মেয়ে আরতীকে ৮ম শ্রেণি পাশের পরই বিয়ে দিয়ে দেন। ছেলে হরেকৃষ্ণ প্রাইভেটে পড়ে এইচ.এস.সি পাস করে বর্তমানে কাউরাট দাখিল মাদ্রাসায় অফিস সহকারী হিসাবে কাজ করছে। ছোট মেয়ে লক্ষ্মীকে ৭ম শ্রেণি পাশের পরই বিয়ে দিয়ে দেন। এটি কেবল একজনের জীবন-সংগ্রাম নয়, মুক্তিযুদ্ধোত্তর লাখো নারীর জীবনচিত্র ফুটে ওঠে এই বয়ানের মধ্যে।

মুক্তিযুদ্ধে উপার্জনক্ষম পরিবার প্রধানকে হারিয়েছিলেন বিপুল সংখ্যক শহীদজায়া। সংসার জীবনে আকস্মিকভাবে কঠোর বাস্তবতার মুখোমুখি হন তারা। স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশে কীভাবে এই নারীরা সংসারের হাল ধরতে বাধ্য হন, সন্তান-সন্ততিদের সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করেন কিংবা করতে ব্যর্থ হন–তা অনুধাবনে এই নারীদের জীবন সংগ্রাম নিয়ে 'মুক্তিযুদ্ধে পরিবার-প্রধানহারা নারীর জীবন সংগ্রাম' শীর্ষক গবেষণাকর্ম পরিচালনা করেছে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর, এবং মাঠ পর্যায়ের তথ্য সংগ্রহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিবারের নেটওয়ার্কভুক্ত শিক্ষক। ৯ মে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সেমিনার হলে গবেষণাটির প্রাথমিক পর্যায় উপস্থাপন করা হয় এবং একটি প্যানেল আলোচনার আয়োজন করা হয়।

স্বাগত বক্তব্যে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি সারা যাকের বলেন, পরিবার-প্রধান শহীদ হওয়ার ঘটনা সেই পরিবারের জন্য খুব নেতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি করে। তবে এর ভিন্ন এক ইতিবাচক দিকও রয়েছে। গবেষণায় দেখা গেছে এই পরিবারগুলো ঘুরে দাঁড়িয়েছে। শহীদজায়ারা আত্ম নির্ভরশীল হয়েছেন, স্বাবলম্বী হয়েছেন।

প্যানেল আলোচনায় শহীদজায়া শ্যামলী নাসরিন চৌধুরী বলেন, মুক্তিযুদ্ধের পর চরম অবহেলিত, উপেক্ষিত, দৃষ্টির আড়ালে থাকা প্রান্তিক নারীদের কথা প্রথমবার এই গবেষণায় উঠে এসেছে। এর একটি গভীর মানবিক তাৎপর্য রয়েছে। শহীদজায়ারা অন্তত এতদিন পরে হলেও অনুভব করেছেন তাদের কথা শোনার কেউ আছেন।

শহীদ-কন্যা মেঘনাগুহ ঠাকুরতার মতে, গবেষণাটি অভিজ্ঞতাভিত্তিক। তথ্য উপাত্য বা পরিসংখ্যানের চেয়ে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা, শ্রদ্ধা, আবেগের মতো মানবিক মূল্যবোধকে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের জন্য এ বিষয়ে ব্যাপক গবেষণা অত্যন্ত জরুরি। তিনি কাজটি শুরু করবার জন্য মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরকে ধন্যবাদ জানান।

অধ্যাপক আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন বলেন মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে প্রায় ৮ হাজার বই প্রকাশিত হয়েছে। এর মধ্যে নারীদের নিয়ে লেখা হয়েছে ১২০টি বই। এর অধিকাংশই নারীদের লেখা এবং বিষয় দেখা যায় নারী মুক্তিযোদ্ধা, বীরাঙ্গণা বা নারীদের স্মৃতিচারণমূলক। শহীদজায়াদের নিয়ে, বিশেষত প্রান্তিক পর্যায়ে অনুসন্ধান করে কাজের কোনো দৃষ্টান্ত নেই। তবে বর্তমান কাজকে আরো বৃহৎ পরিসরে নিয়ে যাবার সুযোগ রয়েছে।

সমাপনী বক্তব্যে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি ডা. সারওয়ার আলী বলেন, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করার পাশাপাশি নিজস্ব উদ্যোগে গবেষণার তাগিদ অনুভব করছে। সেই তাগিদ থেকেই শহীদজায়াদের জীবনসংগ্রাম নিয়ে এই গবেষণার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর এ নিয়ে আরও ব্যাপকভিত্তির গবেষণা করতে আগ্রহী বলে জানান তিনি।

সুলতানার স্বপ্ন অবারিত এবার নতুন এক উচ্চতায়

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর কর্মী অভিযাত্রী ইয়াসমিন লিসা এবার শুরু করছেন এক বিশেষ অভিযান। এই অভিযানের লক্ষ্য খুম্বু রিজিয়নের ৬,১৮৬ মিটার উচ্চতার মাউন্ট কিয়াজো রি আরোহণ। পাশাপাশি ৫,৩৮১ মিটার উচ্চতার সুন্দার পিক এবং ৪,১৬০ মিটার উচ্চতার পিকে আরোহণেরও পরিকল্পনা রয়েছে।

এই অভিযানের আর্থিক পৃষ্ঠপোষকতায় রয়েছে এমটিবি ফাউন্ডেশন। নারীর অগ্রযাত্রা, উদ্যম ও ক্ষমতায়নের ধারাবাহিকতায় প্রতিষ্ঠানটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে। Climbing for Climate, Building for Communities – A Climate Resilience Initiative of MTB Foundation উদ্যোগের মাধ্যমে তারা জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং উপকূলীয় অঞ্চলে টেকসই ও জলবায়ুবান্ধব অবকাঠামো নির্মাণে কাজ করছে– এই বিশেষ উদ্যোগে ইয়াসমিন লিসা এমটিবি ফাউন্ডেশনের ক্লাইমেট চেঞ্জ অ্যাম্বাসেডর হিসেবে যুক্ত থাকবেন এবং জলবায়ু সচেতনতা ও সামাজিক উন্নয়নের বার্তা ছড়িয়ে দিতে কাজ করবেন।

অভিযাত্রী এই সামাজিক উদ্যোগের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করছে এবং বিশ্বাস করে, পাহাড় জয়ের এই অভিযাত্রা একইসঙ্গে নারীর সক্ষমতা, নেতৃত্ব ও ইতিবাচক পরিবর্তনের এক শক্তিশালী প্রতীক হয়ে উঠবে।

ইউনেস্কো ঢাকা অফিস কর্তৃক সমর্থিত এবং মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সাথে সম্পৃক্ত এই অভিযানটির আয়োজক 'অভিযাত্রী'।

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের পক্ষে মফিদুল হক, ট্রাস্টি ও সদস্য-সচিব, এফ-১১/এ-বি, সিভিক সেন্টর, আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ থেকে প্রকাশিত।
সম্পাদক : ড. রেজিনা বেগম, গ্রাফিক্স ডিজাইন : এম আর ইসলাম। ফোন : ৮৮ ০২ ৯১৪২৭৮১-৩,
ইমেইল: mukti.jadughar@gmail.com, ওয়েব: www.liberationwarmuseumbd.org, ফেসবুক: facebook.com/liberationwarmuseum.official